إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ
قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ۝ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ۝
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ
وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الم ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ مَن كَانَ
يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্যে বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফেরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আল-আনকাবূত
মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৬৯

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহ্‌র সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোনাহ্ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, যুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য : যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোষাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোনাহের দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ : আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকরতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্। (রূহুল মা'আনী) তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্ না করলেও তার আলমনামায় গোনাহ্ লিখাহবে।—(গাযযালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ –এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্যে দু'টি বিষয় জরুরী। এক ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং (দুই) তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে, সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ –সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তার ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষ নবী রসূল (সাঃ)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ –অর্থাৎ, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে 'মা'আদে' ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি

বিশেষতঃ হরম ও বায়তুল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্‌ফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছে দেয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্‌ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মদনীওনয়।—কুরতুবী

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ -এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন, وَجْهَهُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে— এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

সূরা আল-কাসাস সমাপ্ত

সূরা আল আনকাবূত

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ – يُفْتَنُونَ শব্দটি فِتْنَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষতঃ পয়গম্বরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ পয়গম্বর, শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেসব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।— (কুরতুবী)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا — অর্থাৎ, এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তাআলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ্ তাআলার জানা আছে।

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جٰهَدٰكَ
لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝٩ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ
لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ
الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ ۝١١ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا
سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ
مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١٢ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ
اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝١٣

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (৮) আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফেক। (১২) কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (১৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ —'হিতাকাঙ্ক্ষা' ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে وصيت বলা হয়।— (মাযহারী)

بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا — حسن শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ — অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শেরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق অর্থাৎ,আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।— (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

(১৪) আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্যে। (১৬) স্মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বোঝ। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব। (১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

করা হয়েছে। বলা হয়েছে, أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ এতে উল্লেখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সংগীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থ-কড়ি দেয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ অর্থাৎ, কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে— একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِي الۡاَرۡضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَمَا
لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِيۡ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ
اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ
اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ
مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي الۡحَيٰوةِ
الدُّنۡيَا ۚ ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ
وَّيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ۫ وَّمَاۡوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمۡ
مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيۡ مُهَاجِرٌ
اِلٰى رَبِّيۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ
وَيَعۡقُوۡبَ وَجَعَلۡنَا فِيۡ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالۡكِتٰبَ
وَاٰتَيۡنٰهُ اَجۡرَهٗ فِي الدُّنۡيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الۡاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيۡنَ ﴿٢٧﴾ وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ
الۡفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٢٨﴾

(২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর প্রেরণ করেছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো— এগুলো সব নূহ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيۡ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيۡ — হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আঃ)-এর মু'জেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, اِنِّيۡ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيۡ অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশ-ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার এবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ্ বলেন, اِنِّيۡ مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ - তে নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার اِنِّيۡ مُهَاجِرٌ - কে হযরত লূত (আঃ)-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আঃ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আঃ)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম পয়গম্বর, যাঁকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।— (কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ
فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا
ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ
انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ
الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا
لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ
رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ
هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ
مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

(২৯) তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রীষ্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ – এখানে লূত (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমৈথুন, দ্বিতীয়,রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গোনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণতঃ পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া। উম্মে-হানী (রাঃ)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসের সবার সামনে করত।—(নাউযুবিল্লাহ্)

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে, ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مستبصر وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ – থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুষ্মানতা এর অর্থ চক্ষুষ্মানত। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শেরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকী বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন্ দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মযলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কেয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রোমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। আয়াত ঃ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ, তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং সে তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ — মাকড়সাকে عنكبوت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسٰكِنِهِمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَلَقَدْ
جَآءَهُم مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا
بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ
إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

(৩৭) কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (৩৯) আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে।

বাসস্থান তৈরী করে। বাহ্যতঃ এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা ঃ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রাঃ) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفقر — অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিষ্কার রাখ। — (রূহুল-মা'আনী)

وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপহাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহ্র কাছে আলেম কে? ঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহ্র কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলে কেউ আল্লাহ্র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ -

(ইবনে- কাসীর)

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا
بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰـهُنَا وَاِلٰـهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ
مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ
مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾
بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ
اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর। (৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করা উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فحشاء শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে منكر বলা যায় না। فحشاء ও منكر শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী اقامت صلوٰة হতে হবে। اقامت এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اقامت صلوٰة এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ, শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন

তাঁর কাছে আবেদন–নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনা–আপনি সৎকর্মের তওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে জিজ্ঞাসা করা হল, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি ? তিনি বললেন, من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلاصلوة له অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে–মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে–আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)–এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।— (ইবনে–কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি ?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ্ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার–সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণ'–এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশেও স্মরণ করেন।

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) আল্লাহ্র এই স্মরণ এবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে–জরীর ও ইবনে–কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

– অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক–বিতর্ক কর। উদাহরণতঃ কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا – কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে – তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ – অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক–বিতর্ক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নহ্লে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে— আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্

তাআলা এইসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি। যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নাই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল آمَنَّا بِالَّذِىٓ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ অর্থাৎ, আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীর গ্রন্থসমূহে তফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ

الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইন্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তুর নয়।

নিরক্ষর হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি বড় মু'জেযা ঃ আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জেযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জেযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে من محمد عبد الله ورسوله লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে من محمد عبد الله লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জেযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন— বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ
وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾
يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۟ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ
صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ
رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ, যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও এবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবতঃ দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا .... – হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ অর্থাৎ, চিন্তা

কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তাআলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়— বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্‌র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্‌রই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? ঃ হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরযে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়; মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সূরা নিসার ৮৯ আয়াতে অর্থাৎ, حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন এই মর্মে আদেশ জারী করেন, لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফেকাহ্‌বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন ঃ

মাসআলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা ঃ কোন দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরী নয়; বরং 'দারুল ফিস্‌ক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমদে আবু ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما اصبت خيرا فاقم অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহ্‌র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্‌র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)